ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 111-118
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.186

‘কৃত্তিবাসে’র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান

শিরিন আক্তার, *লেকচারার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 25.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shankha Ghosh was one of the leading literary figures of the 1950s. The inner and outer dimensions of this proverbial poet’s soul find vivid expression throughout his poetry. His works bear the mark of both the traditional wisdom of Bengali poetry and a conscious insight shaped by a global perspective. Alongside his introspective awareness, the poet was equally stirred by an acute sensitivity to the external world. By giving voice to his inner feelings and transforming them through the alchemy of his poetic sensibility, Shankha Ghosh infused his verses with a unique vitality.

As a result, his poetry inevitably reflects the spirit of his time — the nation, society, and the human condition surrounding him. His personal consciousness blends seamlessly with social awareness, and that social awareness, in turn, connects to a broader cosmopolitan vision. The consequences of the state’s shortsighted decisions, the suffering of the common people, the dominance of power structures, and his compassionate yet protest-driven poetic stance deeply move and engage any lover of poetry.

This paper seeks to explore how this social consciousness resonated within the poet’s inner world during his time, and how that inner awareness blossomed into poetry — how it took shape, through the craft of words, as flowers on the tree of his poetic vision.

Keywords: Shankha Ghosh, Bengali Poetry, Social Consciousness, Inner Awareness, Poetic Vision

বাংলা কবিতার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) একটি শক্তিশালী নাম। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠলেও বাংলা কবিতার পালাবদলের ভূমিকায় এই কবির ভূমিকা অগ্রগণ্য। শঙ্খ ঘোষের কবিতা ‘দিনগুলি রাতগুলি’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রথম সংকলনে ১৯৫৩ সালে। পত্রিকার প্রকাশনা সর্ম্পকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন- “কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রকাশের পেছনে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না, এর জন্ম অনেকটা আকস্মিক।”[১]

কৃত্তিবাস পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংকলনে সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন:

> “কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপাত্র। একেবারে তরুণদের সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের কবিতা এখানে একত্র করা হবে।”[২]

আকস্মিকভাবে জন্ম হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথে তরুণ সাহিত্য সমাজে আলোড়ন পড়েছিল। পত্রিকাটির প্রচ্ছদেই "তরুণতম কবিদের জন্য" লেখা থাকতো। বিশুদ্ধভাবে তরুণদের লেখা কবিতা প্রকাশই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> "প্রথম থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে কৃত্তিবাসে শুধু তরুণদের কবিতাই প্রকাশিত হবে। সেই সময় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কবিতার প্রথম সারির কবিবৃন্দ সকলেই জীবিত এবং সৃষ্টিশীল। আমরা ওঁদের কারো কাছেই লেখার জন্য হাত পাতিনি। কোনো কোনে খ্যাতিমান লেখক নিজ থেকে রচনা পাঠিয়ে আমাদের বিব্রত করেছেন, আমরা সবিনয়ে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছি।"[৩]

উক্ত মন্তব্যটিতেই আসলে কৃত্তিবাসের তেজোদীপ্ত পদচারণার কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই সম্পাদকমন্ডলী চেয়েছিলেন দল, রাজনীতি, মতবাদ-মতাদর্শের উর্ধ্বে এবং প্রচলিত ফর্মের বাইরে গিয়ে কবিতা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠুক এই পত্রিকা। এক সময় এর প্রভাব এত ব্যাপক হয়ে ওঠে যে 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী' নামক আলাদা সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংখ্যাতেই যুক্ত হলো শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতাটি-

> "হে আমার সুনিবিড় তপস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
> ঐ তারা আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ
> আমার স্নান
> বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা-
> কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে?"[৪]

এই 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সান্নিধ্যে এসে যেন শঙ্খ ঘোষ পাঠক সমাজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন অরুণরাঙা আলোর মতো। তারপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কাব্যজগতে সৃষ্টির বিশাল ভান্ডার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কবিতার ধারাকে।

১৯৩২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন শঙ্খ ঘোষ। যাঁর প্রকৃত নাম ছিল চিত্তপ্রিয় ঘোষ। বেড়ে উঠেছেন পৈত্রিক বাড়ি বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে। পাবনায় পিতার কর্মস্থল হওয়ার সুবাদে শঙ্খ ঘোষের জীবন পরিক্রমার বেশ কয়েক বছর কেটেছে পাবনায় এবং সেখানে থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। এক সময় বাংলা কবিতার জগতকে অপরিসীম অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলেন। 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'নিহিত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (১৯৭৪), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪), 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (১৯৯৪) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মূলত কবি হিসেবে অধিক খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর অনুবাদ ও গদ্য রচনার ভান্ডারও বিপুল।

সমাজ ও রাজনীতি সচেতন এই কবির কাব্যে দেশ-কাল উঠে এসেছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার জারক রসে। যেখানে বন্যা, খরা, মন্বন্তর, দেশভাগ উঠে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতির সমান্তরালে এক নব অভিজ্ঞানের আলোয়। যার ফলে সমকালীন কবিদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দিয়েছে মহাকাল। কাব্য ভাবনার দিক থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উঠে এসেছে সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ-কাল এবং সেই সাথে উঠে এসেছে প্রকৃতি চেতনা, প্রেমানুভূতি, নাগরিক দগ্ধতা, কোলাহল, ইত্যাদি। বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পভাবনার দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলা কাব্যে দখল করতে পেরেছেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। দেশ-কাল-সমাজের কথা স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে কবিতার পরতে পরতে। উঠে এসেছে জীবনের কথা, মানুষের কথা।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে এসে আধুনিক বাংলা কাব্যের মোড় অনেকটাই ঘুরে যায়। তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ পঞ্চপান্ডব ছাড়াও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্তি কামনায় একটি আলাদা জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনায়, অভিব্যক্তি প্রকাশের মর্মমূলে ছিল ব্যক্তির

চেতনাবোধ। কবিতার সত্যকে যেন নতুনরূপে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলেন তাঁরা। যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আশা-নিরাশা-হতাশা, ক্লান্তি, অবক্ষয়, শূন্যতাবোধ ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের কবিতার মূল বিষয়। এর পর চল্লিশের দশকে পাওয়া গেল আরেক ঘরানার কবিগোষ্ঠী যাঁরা জীবনের প্রকৃত মানে অনুসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন। চল্লিশের ধারার কবিরা তিরিশের কবিদের কবিতায় চিত্রিত ব্যক্তিক আশা-নিরাশা, শূন্যতাবোধকে ছাপিয়ে সামষ্টিক মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ থেকে শিক্ষা ধারণ করে সমগ্র মানব মুক্তির জয়গানে নিজেদের মেলে ধরেছেন। এর সাথে বিশ্বব্যাপী আগেই যুক্ত হয়েছে মার্কস ও ফ্রয়েডীয় দর্শন। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের এই দিক পরিবর্তন বা পালাবদল, চিন্তা-চেতনার এরূপ ধারা ও পাশ্চাত্য দর্শনের স্রোত এবং বিশ্বযুদ্ধের আঘাত একসাথে মিলে চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এ সকল যুগ পরিক্রমণের ফলেই শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং সেই সাথে হয়ে উঠেছে ধ্বনিময় শিল্পবোধের ধারক ও বাহক।

শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতাটিতে ৭, ৮, ৯, ১১ ও ১২ জানুয়ারির বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করে গুচ্ছ কবিতার মতো তাঁর বিচ্ছিন্ন অনুভূতিকে গেঁথে দিয়েছেন একসূত্রে। এই কবিতার বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি আঙ্গিকের নানাদিক যেন কবিকে চিহ্নিত করে দেয় আলাদাভাবে। কখনো গদ্য ছন্দে, কখনো পুনরাবৃত্তিতে আবার কখনো অন্ত্যমিলের দ্যোতনা উঠে এসেছে কবিতার স্তবকে স্তবকে-

"তুমি টেনে নেবে গান-
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর
দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-অশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী"[৫]

কবিতাটিতে কবির আপন সত্তাটি যেন কবিসত্তা থেকে পৃথক হয়ে আত্ম-সংশ্লেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একই কবিতার অন্য অংশে কবি যেন আপন ভঙ্গিমায় গেয়ে ওঠেন-

"কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ-
... কবি রে আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!"[৬]

যে ভূমিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সে ধরিত্রী মাতার সাথে সন্তানের গড়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কবি শঙ্খ ঘোষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণায় আহত হৃদয়ের ব্যথাতুর বয়ান। দেশভাগের দরুণ শেকড় হারানোর বাস্তব ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সের লেখা কবর কবিতায় দেখি-

"আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে-
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতে শস্য যেন ফলে।"[৭]

অস্থিরতায় দগ্ধ হৃদয়ের দেখা মেলে প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে। শিশুসূর্য কবিতায় যা উঠে এসেছে-

"এ কোন দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতামুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার
ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র-আলিঙ্গনে হুতাশী জনসঙ্ঘের গুরুসংখ্যা।"[৮]

কবিতাটিতে স্খলিত, দুর্বল, হাহাকারে পরিপূর্ণ এক রাষ্ট্রের কথা ধ্বনিত হয়েছে, যে রাষ্ট্র সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া ক্ষুধায় কাতর শিশুর মতোই ক্ষীণকায়-দুর্বল। দেশের এই অপূর্ণতা যেন কবিকে নির্মম শেলে বিদ্ধ করার সাথে সাথে পাঠকের চিত্তকেও বিদ্ধ করে। দেশকে ঘিরে তাঁর বিষাদের কালো ছাঁয়া তাঁর হৃদয়ে ছাপ ফেলেছে গভীরভাবে। স্বাধীনতা লাভ পরবর্তী দেশব্যাপি বিশৃঙ্খলা, অন্নাভাব, অন্যায়-দুর্ভোগ ইত্যাদির কারণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে কবির সংবেদনশীল হৃদয়। কবির কাছে দেশ কেবলই দেশ নয়, কেবলই মাটি নয় বরং তার থেকেও অধিক কিছু। 'স্বদেশ

স্বদেশ করিস কারে' কবিতায় মিশে আছে পার্টিশনের দরুণ বেদনামথিত স্মৃতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হৃদয়ের আকুলতার ধ্বনি-

"তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।"[৯]

দেশ কেবলই জন্মভূমি নয়, কেবলই বেড়ে ওঠার সুবর্ণভুমি নয় বরং সমস্ত চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন-বোধ-কল্পনার অবিমিশ্র স্বরায়ণ। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচেতনায় স্বদেশের নানা মূর্তি ধরা পড়েছে। এ দেশের বুকে সময়ের পরিক্রমায় যা অনুভূত হয়েছে গভীরভাবে। কখনো এই দেশ কবির বাল্যসহচর আবার কখনো দেশ শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা বেদনার ধারা, কখনো বা বেদনার সঙ্গী। বলো তারে শান্তি শান্তি কবিতায় দেশ কবির কাছে অপত্য স্নেহের আধারে মাতৃরূপে উঠে এসেছে-

"মাগো, আমার মা
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেওনা।"[১০]

কবি হৃদয়ের আকুলতা এই-কেবল কবির কাছাকাছি পরম মমতায় তাঁর মাতৃরূপী দেশ থাকুক। এই দেশ মা যেন আর কোথাও না যান অর্থাৎ মাতা এবং সন্তানের যেন কিছুতেই বিচ্ছেদ না ঘটে। মূলত কবি হৃদয়ের প্রগাঢ় দেশপ্রেম যেন কবিকে অভিন্ন বন্ধনে গেঁথে দেয়। যে বন্ধন না ছেড়ার জন্য কবি চিত্তের আকুল আবেদন। আবার চারিদিকের বিক্ষুব্ধ-বঞ্চনায় মাকে যেন অভয় দিতে দিতে কবি একই কবিতার চার সংখ্যক স্তবকে বলে ওঠেন-

"মাগো আমার মা-
ঝড় নেমেছে, দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক ভয়ে পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা!"[১১]

ধুলিমাখা পথ থেকে শুরু করে রৌদ্ররথের শহরগ্রাম অর্থাৎ দেশ-প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ যেভাবে এসেছে কবিতাটিতে সেভাবেই আবার দেশ মাকে নানান বিপদে শঙ্কা না করে সাহস নিয়ে থাকার বরাভয় দিতে দেখি।

বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থাৎ দুই বাংলার মানুষের জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষত হয়ে আছে দেশভাগ। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচেতনায় এ দেশ হারানো ক্ষতের কথা, ফেলে আসা স্মৃতির রোমন্থন দেখতে পাই। ছেড়ে আসা গ্রাম, শৈশবের আঙিনা, প্রকৃতি-মাঠ-নদী যেন বারবার উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর ফুলবাজার কবিতাটি যেন তারই স্মৃতিমাখা বেদনার বয়ান-

"পদ্ম, তোর কথা মনে পড়ে কালযমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?
স্পষ্ট নৌকো, ছই ছিল না, ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বন্যা মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা।"[১২]

কবিতায় কবির স্মৃতির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যমুনা, ছইহীন নৌকো, ভাঙাবৈঠা যা কবি ফেলে গিয়েছেন অতীতের কাছে। আবার 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' কবিতায়ও যেন সে কথাই উঠে এসেছে-

"ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে-
ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!"[১৩]

'আদিম লতাগুল্মময়' কাব্যের দুই বাংলা, দেশহীন, ব্যভিচার, একা কবিতাসহ আরো বেশ কিছু কবিতায় দেশভাগের যন্ত্রণা পরিস্ফূটিত হয়েছে গভীরভাবে। দুই বাংলা কবিতায় দেখি-

"আমার এ দুটি কলুষমাখানো হাতে

নিতে চেয়েছিলে তোমার বুকের কাছে,
তোমার দুখানি রক্তরাঙানো হাত
আমার মাথায় রাখো, মার্জনা করো।"[১৪]

রক্তরাঙানো, কলুষমাখানো হাত দুখানি বুকের কাছে নিয়ে মার্জনা প্রার্থনাই যেন উচ্চারিত হয়েছে এ কবিতায়। নিজ জন্মস্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বেদনা মথিত ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতিই কেবল প্রকাশ হয়নি তাঁর কবিতায় বরং দেশভাগের ফলে শেকড় হারানো, শৈশব হারানো এমনকি সমগ্র ভুবন হারানো মানুষের হাহাকার মিশে সামষ্টিক চেতনার ধ্বনি হয়ে ওঠে কবিতাগুলো।

কখনো শাসকের অদূরদর্শীতার ফলে কখনো বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খরা কবলিত হয়েছে প্রিয় স্বর্গভূমি। অনাবৃষ্টি আর খরার রূপটি তাঁর 'খরা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ কবিতায় দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়-

"অগ্নিজোড়া তেপান্তর ধু ধু বালুর মাঠ
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে!
গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁখে-পোড়া এ তল্লাট
কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে-
বর্ষা দিল না:
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।"[১৫]

কবিতাটিতে গ্রীষ্মের দাবদাহতা যেন জন-জীবনকে শঙ্কিত করে তুলেছে। মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, মাঠের ফসল সমস্ত কিছু যেন চাতকের মতো বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে কিন্তু ধরিত্রীকে শান্ত করে বৃষ্টি না নেমে যেন রহস্যময়ী ললনার মতো অধরা হয়ে উঠেছে।

'যমুনাবতী' কবিতায় সময়ের বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে গভীরভাবে। একদিকে মন্বন্তরের ভয়াবহতা অন্যদিকে দুই বাংলার মানুষের বন্দিদশার চিত্র ফুটে উঠেছে। এর সাথে নিপুণ দক্ষতায় কবি গেথেঁ দিয়েছেন রূপকথার যমুনাবতীকে। সরস্বতীরূপী যমুনাবতী যেন আকাশ-পাতাল ভেদ করে মর্ত্যের রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে মিশে গেছেন অভুক্তদের দলে। কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলন চলাকালীন মিছিলেই পুলিশের গুলিতে কিশোরী হত্যার প্রতিবাদরূপে কবিতাটি যেন এক রক্তাক্ত দলিল। প্রতিবাদী স্বর হয়ে কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে:

"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিয়ের টোপর নিয়ে।"[১৬]

সদ্য ঘুচে আসা মন্বন্তরের দেশে খাদ্যের জন্য কিশোরী হত্যা যেন তৎকালীন শাসক-শোষকদের ক্ষমতাতন্ত্রকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

"রূপকথার যমুনাবতী সরস্বতীর বিয়ে হয় আনন্দঘন পরিবেশে-নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় কাজীতলা দিয়ে ।কিন্তু বাস্তবের যমুনাবতীর কপালে সে সুখ নেই।"[১৭]

কবির ভাষায়:

"যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।
নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফেলেছে!"[১৮]

অধিকার আদায়ের পথে এই কিশোরীর ত্যাগ যেন পরবর্তী কোন স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল। সমকালীন রাজনীতির নানান ঘটনার দ্বারাও শঙ্খ ঘোষ ব্যথিত হয়েছেন বারংবার। রাজ্য রাজনীতির দিকটিও তাঁর চোখ এড়ায়নি। কখনো বা আক্রমণের শিকার হয়েছেন কবিতা লিখে। নন্দীগ্রাম ঘটনায় কবির 'সবিনয় নিবেদন' কবিতাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কবিতায় দেখি:

"আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে

যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।"[১৯]

যুগযন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাত কবি শঙ্খ ঘোষের চিত্তকে করেছে ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত। নিহিত পাতাল ছায়ার 'মাতাল' কবিতায় বলে উঠেছেন:

"আরো একটু মাতাল করে দাও
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবেনা!
ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও-
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবেনা।"[২০]

সইতে পারা ও বইতে পারা বক্তব্য দুটি যেন বিষয় ভাবনার দিক থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বিশ্বসংসারের চলমান ঘটনার নানা অভিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যাযজ্ঞ, মন্বন্তর, দুর্দশা এসব কিছু যেন একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ মেনে নিতে পারবে না।তাই ইশ্বরের কাছে আরো একটু মাতাল করে দেওয়ার জন্য সংবেনশীল কবি হৃদয়ের গভীর অনুনয় দেখতে পাই কবিতাটিতে।

> "যে কোনো মানুষের সমাজের প্রতি কিছু দায় থাকে। কবিরও তা আছে সে দায় তিনি ব্যক্তিগত স্তরে বহন করবেন, এটা প্রত্যাশিত সব কবি তা করেন না, সব ব্যক্তি মানুষও করেন না তা, সেটা ভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এই দায় বহন করার মানে এই নয় যে, কবিতায় একজন কবিকে সবসময় সমাজের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। এমনকী কোন সময়ই তেমন তিনি না বলতে পারেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি সমাজ বিমুখ। কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে যদি ভিন্নতর কোনো সত্যের কোনো সুন্দরের বোধ তৈরি হয়ে ওঠে, কোনো কল্পনা জগতের যদি প্রসার হয়ে থাকে সেও তো সমাজেরই কাজ, সামাজিক মননকে উদ্বোধিত করে তুলবারই কাজ।"[২১]

এই সৃজন প্রেরণার উৎস হিসেবে যেন শঙ্খের কবিতাগুলো পেয়েছে পূর্ণাঙ্গতা। নিজের কথার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন ঘরের কথা। ঘরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন স্বদেশের কথা, আবার স্বদেশের সাথে বিশ্বের কথা যেন কবিতার পরতে পরতে সজ্জিত হয়ে আছে। ব্যক্তিক দহন থেকে যেন কবিতা ছুঁয়ে গেছে স্বদেশ যন্ত্রণায়, স্বদেশ থেকে যেন সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে- 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'র মত ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতায়:

"একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাবো
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
একটা দুটো সহজ কথা
বলবো ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।"[২২]

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন বুর্জোয়া প্রতিপত্তির জয়জয়কার তখন রোমান্টিক কিংবা ব্যক্তিগত চাওয়াও যেন পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য হয়ে যায়। কবিতাটি যেন তারই বাস্তব চিত্র। তাঁর চিন্তা চেতনার অভিজ্ঞান, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা-যোগাযোগহীনতার বিষয়টিও যেন কবিতায় অঙ্কিত হয়ে আছে- 'ভিড়', 'রাস্তা', 'কালকাতা'র মতো কবিতাগুলোতে। পাশাপাশি এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনার চিরকালীন গাঁ বাঁচানোর দ্বান্দ্বিক অবস্থানটি। বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট 'ভিড়' কবিতায় উঠে এসেছে:

"ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান-'।"[২৩]

কবিতার এই অংশ পাঠে মনে হয় যে বাসে বা ট্রামে সহযাত্রী কিংবা কনডাক্টরের ভাষ্যে কবির প্রতি ছোটো হয়ে নেমে পড়ার পরামর্শ এবং কবিতার বাকি অংশে আমরা চিরকালীন মধ্যবিত্তের চিন্তার ছাপ আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখি:

"আরো কত ছেটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমরাও সমান
সদরে বাজারে, আড়ালে?"[২৪]

কবির এই বোধ যেন পাঠককে নিয়ে যায় একই কাতারে যেখানে সময়ের সাথে নিজের অস্তিত্বের লড়াই চলতে থাকে সর্বত্র। যা 'রাস্তা' কবিতায় আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছে-

"রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন
মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন।"[২৫]

অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ভান্ডারের এক বিশাল জগত জুড়ে রয়েছে দেশ-কাল-সমাজ তথা মানুষের কথা। সমাজের অপরিহার্য উপাদান মানুষের জীবন নানাভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে। কখনো রাজনীতির করালগ্রাসে কখনো আবার ক্ষমতাতন্ত্রের বাড়াবাড়িতে জনজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটপাটের রাজনীতি মানুষের জীবনের শান্তিকে নষ্ট করেছে, চরমভাবে ব্যাঘাত ঘটেছে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের। বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে অস্থিতিশীলতা তার সাথে যেন শঙ্খের কবিতাগুলো অপরিহার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ফলে কবিতাগুলো যেন দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষের চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। কবির ভাষ্যে:

> "কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে? না কি আমার ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে? এই ছিল তর্ক, দেশ বিদেশের বহু পূর্বকালের তর্ক। কিন্তু এই দুই কি ভিন্ন না কি? এই দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ? তার থেকেই কি তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় সত্তা? ...আমারও তেমনি এক থেকে আরেক টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছানো।"[২৬]

এখানেই যেন কবির বাণী কাল ভ্রমণে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত থেকে বিশ্বকালে প্রসারিত হয়ে উঠেছে। রফিকুল্লাহ খানের মতে:

> "মানুষের সমস্ত সৃজন প্রেরণার উৎস তার সমাজ ও সময়। সমাজ ও সময় লালিত হবার ফলেই ব্যক্তির সংবেদনা, আবেগ, অনুভব ও জীবনকল্পনা সমষ্টির মধ্যে মুক্তির সন্ধান করে। মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত উপকরণপুঞ্জের সুসম ঐক্যে যে সমাজচৈতন্য নির্মিত, তার সঙ্গে স্বধর্ম ও অণ্বেষণের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের যূথবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে তার অস্তিত্ব-সংকট ও সেই সংকট অতিক্রমণের অনিবার্যতাবোধ থেকে এবং এই অস্তিত্ব সংগ্রামরত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংঘাত, রক্তপাত, অচরিতার্থতা, যন্ত্রণা প্রভৃতির সামাজিক অভিব্যক্তিই শিল্প-সাহিত্য।"[২৭]

খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে শঙ্খ ঘোষের কবিতার শরীর জুড়ে রয়েছে ভেতর-বাইরের উভয় রকমের বাস্তবতা। যে বাস্তবতা ব্যক্তিগত জীবনবীক্ষার সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব-বীক্ষার দিকে ধাবিত হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিগত 'আমি'কে ছাড়িয়ে সামষ্টিক আমিতে পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে কবিতায় বর্ণিত দেশ-কাল-সমাজ কিংবা মানুষের কথা যেন অনিবার্যভাবেই হয়ে ওঠে বিশ্বের সমগ্র মানুষের কথা তথা সামষ্টিক চেতনার কথা যা শঙ্খ ঘোষের কবিতা জুড়ে উঠে এসেছে আলাদা আলাদা ভঙ্গিতে।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.) । কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর: নির্বাচিত সংকলন ১। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.) । কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর: নির্বাচিত সংকলন ১। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯।

৩. তদেব, পৃ. ৯।

৪. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৯।

৫. ঘোষ, শঙ্খ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১।

৬.তদেব, পৃ. ২১।

৭.তদেব, পৃ. ৩২।

৮. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৪।

৯. ঘোষ, শঙ্খ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৪।

১০. তদেব, পৃ. ৪৪।

১১.তদেব, পৃ. ৪৬।

১২.তদেব, পৃ. ৭৪।

১৩. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৫।

১৪.তদেব, পৃ. ১৫১।

১৫.তদেব, পৃ. ৪৩।

১৬.তদেব, পৃ. ৪৮।

১৭. মিশ্র, ড. অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা। ৩য় সংস্করণ, ২০১৩, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৬৫।

১৮. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৮।

১৯. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২৬

২০. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৬৪।

২১. ঘোষ, শঙ্খ। কথার পীঠে কথা। প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪৮।

২২. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতসংগ্রহ-২। তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৮৮।

২৩. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতসংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৮।

২৪. তদেব, পৃ. ৭২।

২৫. তদেব,৭২।

২৬. ঘোষ, শঙ্খ। কবিতার মুহূর্ত। অনুষ্টুপ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কল-০৯, পৃ. ১৫-১৬।

২৭. খান, রফিকুল্লাহ। কবিতা ও সমাজ। ঢাকা-১১০০: মাওলা ব্রাদাস, প্রথম বাংলা একাডেমি সংস্করণ ১৯৮৫, বর্তমান সংস্করণ ফেব্রয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১।